# প্রিয় প্রসূনদা স্মরণে

□ অপরেশ ভৌমিক □

শোকবিহ্বলচিত্ত ও ব্যথাতুর মনেরই বহিঃপ্রকাশ।

আমি ওর আবেগ বাড়তে না দিয়ে তখনই বার্তালাপ বন্ধ করে মোবাইলটা রেখে দিই।

আজকাল চেটেপুটে তৃপ্তিতে খাবার খেতে পারি না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আহার্যসামগ্রী গলাধঃকরণ করে থাকি। অনেকটা গাড়ির ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরার মত। আজ দ্বি-প্রাহরিক আহার পর্বে প্রসূনদার মৃত্যু সংবাদটা পেয়ে পুরো খাবার গলাধঃকরণ করতে পারিনি। পাতে অবশিষ্ট রেখেই হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে বসি।

দুপুরে প্রসূনদার মৃত্যু সংবাদটা পাওয়ার আগে সকালবেলা চা-পানের সময়ও একটা শোকবার্তা পাই। লক্ষ্মণ দ্রাওসিংকা তাঁর মোবাইল দিয়ে দিকে দিকে বার্তা পাঠিয়েছেন। সেই বার্তা আমার মোবাইলেও ধরা দেয়। বার্তাটি হল প্রাক্তন আরএসএস প্রধান মাননীয় সুদর্শনজি আজ সকাল ৬-৩০ ঘটিকায় দেহরক্ষা করেছেন। আগামীকাল অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় নাগপুরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

কুপহল্লি সীতারামাইয়া সুদর্শন খুব বড় মাপের লোক। দেশ-বিদেশে তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামী রয়েছেন। তিনি রাষ্ট্র ঋষি। রাষ্ট্রহিতে নিজেকে উৎসর্গ করে সঙ্ঘের প্রধান হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যই সংগঠন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। কালের অমোঘ নিয়মেই তাঁর অশরীরি আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেছে—এমনটাই সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকালবেলা মোবাইল বার্তায় মাননীয় সুদর্শনজির মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে এভাবেই মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিন্তু দুপুরবেলায় প্রসূনদার মৃত্যু সংবাদটা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। কারণ আমার বাকি জীবনের জন্য একজন সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী হারালাম—যিনি বিগত দিনে আমার আনন্দে আনন্দিত হতেন এবং দুঃখে মর্মাহত হতেন।

কারুর সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ না করে আমি এরকম ভেবেই চুপচাপ বসে থাকি। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলে কী হবে? মনে তখন দুর্বার আলোড়ন। স্মৃতির পর্দায় আমার জীবনের ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি প্রসূনদাকে জড়িয়ে ঘটনাগুলো একের পর এক ভাসতে থাকে। আর ওই সময়েই আমার কাছে আরেকটি ফোন আসে। ফোনটা করেন শ্রীমতী মিতা দাসপুরকায়স্থ। ফোনে ও যা বলেছে তা হল—আমি প্রসূনদার কাছের মানুষ, তাই প্রসূনদাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে ওর কাছে যেন একটা লেখা পাঠাই কাগজে প্রকাশ করার জন্য।

কী আশ্চর্য ব্যাপার। প্রসূনদাকে নিয়েই যখন স্মৃতির ভেলায় ভাসছি তখনই প্রসূনদাকে নিয়ে স্মৃতিচারণের লেখা পাঠানোর আবেদন। এখন জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে আমি আমার ভাবনাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করি। সেই নিজস্ব ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু এই মুহূর্তে প্রসূনদাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে লেখা পাঠানোর সংবেদনশীল আবেদন আমি কী করে উপেক্ষা করি? তাই ওর আবেদনে নিমরাজি হয়েই প্রসূনদার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি ও পরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাঁকে নিয়ে আমার স্মৃতিকথা নিবেদন করছি। তবে স্মৃতির ভাণ্ডারে স্তূপীভূত সব ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তো এখানে লিপিবদ্ধ করতে পারব না।

প্রসূনদা আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমি যখন স্কুলে উচ্চশ্রেণীতে পড়তাম, তখন প্রসূনদা কলেজে পড়তেন। প্রসূনদার হাতেই আমার সাহিত্যকর্মের হাতেখড়ি। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় দক্ষিণ শিলচরে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করি।

১৯৫৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গুরুচরণ কলেজে ভর্তি হই। তখন প্রসূনদাও গুরুচরণ কলেজে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় ছাত্র-গৃহশিক্ষকের গণ্ডী ভেদ করে প্রসূনদাকে আরও কাছ থেকে দেখতে পাই। প্রবাদপ্রতিম শিক্ষাবিদ গুরুচরণ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরীর প্রতি গুরুচরণ কলেজ পরিচালনা সমিতির অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা ভূমিকায় প্রসূনদাকে দেখি। সে সময়ই ১৯৬০ সালে নেতাজির ৬৩তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য গঠিত দক্ষিণ শিলচর নেতাজি জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটির প্রবন্ধ ও বিতর্ক বিভাগের সম্পাদক ছিলেন প্রসূনদা। ওই বছরই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রী সুরেশ চন্দ্র বসু প্রধান অতিথি হিসাবে শিলচর এসেছিলেন। নেতাজি অগ্রজ শ্রী সুরেশ চন্দ্র মহাশয় সেবার নেতাজি বিদ্যাভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। সেসময় নেতাজি বিদ্যাভবনের গঠন প্রক্রিয়ায় এলাকার আদর্শ যুবক প্রসূনদার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রসূনদা ১৯৬০ সালে শিলচরে দ্বিতীয় মেডিক্যাল কলেজ ডিমান্ড কমিটির সক্রিয় যুবকর্মী হিসাবে পথসভা এবং জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬১ সালের ১৯ শে মে বিকালবেলা শিলচর সিভিল হাসপাতাল চত্বরে রেলস্টেশনে পুলিশের গুলিতে নিহতদেরকে দেখে বুক ফাটা আর্তনাদ করেছিলেন। চিৎকার দিয়ে আসাম সরকারের বর্বরোচিত আচরণকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন যদিও তিনি কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সত্যাগ্রহী হিসাবে ১৯ শে মে'র সর্বাত্মক হরতালে যোগ দেননি।

শিলচরে সাহিত্য কর্মকাণ্ডের পরিমণ্ডল গড়ে উঠার ঊষালগ্ন থেকেই প্রসূনদা জড়িত ছিলেন। কবি দেবেন্দ্র কুমার পালচৌধুরী, আইনজীবী শ্রী নগেন্দ্র শ্যাম ও অন্যান্য সাহিত্য প্রিয় মহাশয়দের অনুপ্রেরণায় শিলচরে তৎকালীন সাহিত্য কর্মীদের দ্বারা গঠিত সাহিত্য চক্রের প্রসূনদাও একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শিলচরকে কবির শহর নামে আখ্যা দেওয়া অতন্ত্র কবি গোষ্ঠীর শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও বিমল চৌধুরীর সঙ্গে প্রসূনদার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তবে কবির শহর শিলচর বলে প্রসূনদাকে কোনওদিন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখিনি।

সংগীত জগতেও প্রসূনদার বিচরণ ছিল বেশ ভালোই। তিনি গাইতে পারতেন এবং সংগীতের দল গঠন করে তালিম দিতেন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একনিষ্ঠ ভক্ত। মিশনের সকল প্রকার অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতেন। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার আগে ষাটের দশকের শেষ দিকে শিলচরের রামকৃষ্ণ মিশনেই ছিল প্রসূনদার আস্তানা। আমি বারকয়েক ওখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি।

পরবর্তী সময়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের দায়বদ্ধতা এবং আরও সব নানা জটিল কারণে উভয়েরই সশরীরে সাক্ষাৎ এবং যোগাযোগে সময়ের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তবে শিলচরের বাইরে কোথাও না গেলে দু-তিন মাস অন্তর অন্তর একবার রজনী এপার্টমেন্টের বাড়িতে গিয়ে প্রসূনদাকে দেখে আসতাম। এবারে এই দু-তিন মাসের ফাঁকেই প্রসূনদা দিব্যি চলে গেলেন চিরতরের জন্য। আমি অবশ্য ভাববো প্রসূনদার দেহটা চিরতরে চলে গেলেও দেহী প্রসূনদা আমার পাশে পাশেই আছেন। আমার জীবদ্দশায়, যতদিন জ্ঞান থাকবে দেহী প্রসূনদার শুভকামনা থেকে বঞ্চিত হব না।